বোকাবাক্স : প্রধান সন্দেহভাজন

(টেলিভিশন ও ইন্টারনেটের কুপ্রভাব এবং উত্তরণের উপায়)

মূল

শাইখ ওয়াহিদ আবদুস সালাম বালি

অনুবাদ ও সংযোজন

মুহাম্মাদ ইউসুফ শাহ

সন্দীপন

প্রকাশন লিমিটেড

অন্দরমহল

লেখকের ভূমিকা ৯
বাংলা সংস্করণের ভূমিকা ১০

প্রাইম সাসপেক্ট : প্রধান সন্দেহভাজন! ১২
আমাদের জীবনে মিডিয়ার প্রভাব ১৪
মিডিয়া কীভাবে মানুষের মনোজগৎ নিয়ন্ত্রণ করে? ২৫
প্রথমত, সাংস্কৃতিক নিয়ন্ত্রণ ৩০
দ্বিতীয়ত, অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ ৪০
তৃতীয়ত, বৈশ্বিক মিডিয়া কার্যক্রমের একচোখা নীতি ৪৬
চতুর্থত, মিডিয়ার ব্যাপক বিস্তার যখন নতুন হুমকি ৫০
মিডিয়ার স্বাধীনতা ও মা-শিশুর সংস্কৃতি ৫৬
প্রথমত, মিডিয়া স্বাধীনতার সংজ্ঞা ও এর বাস্তবায়ন ৫৮
দ্বিতীয়ত, শিশুর সংস্কৃতি ৬৩
তৃতীয়ত, নারীবাদ ৬৭
টেলিভিশন ও আমাদের শিশুরা ৭২
টেলিভিশন আসক্তি ৭৬
টেলিভিশন ও নৈতিক অবক্ষয়ের বিস্তার ৮০
তরুণ প্রজন্মের ওপর টেলিভিশনের প্রভাবের কিছু নমুনা ৮৪
টেলিভিশন ও অপরাধ ৯০
প্রেস রিপোর্টস ৯৪
টেলিভিশন ও বিবাহ বিচ্ছেদ ৯৮
টেলিভিশন ও নৈতিক অবক্ষয় ১০০

টেলিভিশন ও ঐতিহ্যগত মূল্যবোধের বিলুপ্তি ১০৪
শিক্ষার্থীদের পড়ালেখার ওপর টেলিভিশনের প্রভাব ১০৭
টিভি দেখার স্বাস্থ্যগত ক্ষতি ১০৯
টিভি দেখার দীর্ঘমেয়াদি স্বাস্থ্যগত ক্ষতি ১১২
টেলিভিশনের অর্থনৈতিক ক্ষতি ১১৫
টেলিভিশন দেখার ফলে শিশুদের তাওহীদের আকীদা ক্ষতিগ্রস্ত হয় ১১৯
মুসলিম শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশে কার্টুনের প্রভাব ১২৩
শিশুদের ভবিষ্যতের ওপর টিভি দেখার প্রভাব ১২৮
টেলিভিশন আত্মমর্যাদাহীনতা সৃষ্টি করে ১৩২
টেলিভিশন আল-ওয়ালা ওয়াল-বারা'র আকীদা দুর্বল করে ১৩৪
টেলিভিশন ইসলামের ইতিহাস বিকৃত করে ১৩৬
টেলিভিশনের কারণে পিতা-মাতা সন্তানকে অবহেলা করে ১৩৮
টেলিভিশন ও বৈবাহিক সম্পর্ক২২টেলিভিশন ও সম্পদের অপচয় ১৪০
টেলিভিশন ও ধূমপান ১৪১
টেলিভিশন ও জাতীয়তাবাদ ১৪২
টেলিভিশন ও সালাত ১৪৫
টেলিভিশন ও আমলনামা! ১৪৮
ইসলামি শারীয়াতের দৃষ্টিতে টেলিভিশন ১৫১
টিভিতে রেসলিং দেখা ১৫২
টিভিতে খবর দেখা ১৫৩
টিভিতে ফুটবল ম্যাচ দেখা ১৫৪
শুধুমাত্র উপকারী অনুষ্ঠান দেখার জন্য টিভি রাখা যাবে কি? ১৫৫
টিভি বিক্রির বৈধতা আছে কি? ১৫৬
টেলিভিশনের সমাধান কী? ১৫৭
ইন্টারনেটের প্রতি আমাদের মানসিকতা ১৬০
ইন্টারনেটের ব্যাপারে মক্কার আলিমদের ফাতাওয়া ১৬১
টিভি দেখা সম্পর্কে মক্কা ও আল-আজহারের আলিমদের ফাতাওয়া ১৬২

সংযোজন

ইসলাম কিউএ হতে নির্বাচিত ফাতওয়া ১৬৩

১. টিভি দেখার বিধান (ইসলাম কিউএ) ১৬৩

২. ইন্টারনেটে প্রচারিত গুজব ও সংবাদের প্রতি আমাদের মানসিকতা ১৬৪

৩. ফেসবুকে সাইন আপ করা ও যোগদানের হুকুম কী? ১৬৫

৪. মজা করার জন্য চ্যাট রুমে প্রবেশের বিধান ১৬৬

৫. গাইর মাহরাম নারী পুরুষের চ্যাটিং এর বিধান ১৬৭

বাড়িতে টেলিভিশন রাখার ক্ষতি সম্পর্কে কিছু জরুরি কথা ১৬৮

আপনার ঘরের আগন্তুক : টিভি ও শিশুমন | ড. সুসান আর জনসন ১৬৯

এক আগন্তুকের কাহিনি ১৭০

নির্বাচিত উক্তি ১৭১

বেলাশেষে সব ঝিরঝির! ১৭২

লেখকের ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য; আমরা তাঁর কাছেই সাহায্য চাই। তাঁর কাছেই হিদায়াত ও ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আমাদের মন্দ আমল ও নফসের ক্ষতি থেকে তাঁর কাছেই আশ্রয় চাইছি। তিনি যাকে পথ দেখান, তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারে না; আর যাকে তিনি পথভ্রষ্টতায় ছেড়ে দেন, তাকে পথ দেখানোর কেউ নেই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তিনি শরিক-বিহীন এবং আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল।

এই বইটি আলোচ্য বিষয়ের ওপর প্রদানকৃত একটি লেকচার সিরিজ ও বিভিন্ন খুতবার সংকলন। আল্লাহ তাআলা এই কাজকে আমার নেক আমলের খাতায় কবুল করে নিন।

শাইখ ওয়াহিদ আবদুস সালাম বালি
১১ রবিউল আউয়াল, ১৪১৯ হিজরি
মানশাত আব্বাস।

বাংলা সংস্করণের ভূমিকা

যতই দিন যাচ্ছে ততই মানুষ ইলেকট্রনিক স্ক্রিনের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে। এসব স্ক্রিনের মধ্যে টেলিভিশন সবচেয়ে পুরোনো। এ ছাড়াও আছে ডেস্কটপ, মনিটর, ল্যাপটপ, ট্যাবলেট, স্মার্টফোন ইত্যাদি।

১৯২৬ সালে ব্রিটিশ বিজ্ঞানী জন লজি বেয়ার্ড সাদাকালো ছবিকে দূরবর্তী স্থানে বৈদ্যুতিক সম্প্রচারের মাধ্যমে পাঠাতে সক্ষম হন। এই ঘটনাকেই প্রথম টেলিভিশন আবিষ্কার হিসেবে ধরা হয়, যদিও এর আগে অন্যান্য বিজ্ঞানীরাও ইলেকট্রনিক সিগনালের মাধ্যমে দূরবর্তী স্থানে স্থির ছবি পাঠানোর পদ্ধতি আবিষ্কার করেছিলেন। ১৯৪০ সাল থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে টেলিভিশনের বাণিজ্যিক ব্যবহার শুরু হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিভিন্ন ধনী দেশে নিয়মিত টিভি অনুষ্ঠান সম্প্রচার শুরু হয়। আর আমাদের দেশে ১৯৬৪ সালের ২৫ ডিসেম্বর তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে প্রথম টিভি অনুষ্ঠান সম্প্রচার শুরু হয়। ১৯৮০ সাল থেকে বাংলাদেশে সাদাকালোর পরিবর্তে রঙিন অনুষ্ঠান সম্প্রচার শুরু হয়। পরবর্তী ইতিহাস কমবেশি আমরা সবাই জানি, ১৯৯০ সালের আগে বাংলাদেশে স্যাটেলাইট ডিশের আবির্ভাব ঘটেনি। এরপর ক্রমান্বয়ে একের পর এক দেশি-বিদেশি চ্যানেলের আবির্ভাব ঘটেছে। বর্তমানে প্রায় প্রতিটি বাড়িতেই এই যন্ত্রটি চলছে।

যেকোনো বিষয়ের যখন প্রথম আবির্ভাব ঘটে তখন আমাদের মধ্যে অনেক কৌতূহল কাজ করে। যন্ত্রটি কী, কীভাবে কাজ করে, এর সুবিধা-অসুবিধা কী, লাভ-ক্ষতি, উপকারিতা- অপকারিতা ইত্যাদি জানার আগ্রহ থাকে। এরপর ধীরে ধীরে অনেক কিছুই 'দেখতে দেখতে সয়ে যায়।' সে অনুসারে আজকাল প্রায় সকল বাড়িতে টিভি রাখা ও টিভি দেখা একটি অতি স্বাভাবিক বিষয়ে পরিণত হয়েছে।

কিন্তু দ্বীনদার মুসলিমদের কাছে এই যন্ত্রটি শুরু থেকেই নানামুখী সমালোচনার শিকার। এ ছাড়া অমুসলিম হয়েও অনেক ব্যক্তি বিভিন্ন কারণে বাড়িতে টিভি রাখেন না। আসলে এই যন্ত্রটি ঠিক কতটা প্রভাবশালী? আগেকার বিশালাকৃতির

টেলিভিশন নানারূপে পরিবর্তিত হয়ে এখন সকলের হাতে হাতে মুঠোফোনে পৌঁছে গেছে। প্রতিদিন অনেক গুরুত্বপূর্ণ সময় চলে যাচ্ছে এই ইলেকট্রনিক স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে। এর কাছ থেকে আমরা কী পাচ্ছি, আর কী হারাচ্ছি? আমাদের জীবনে এসবের গুরুত্ব কতটুকু? যদি আগে কখনো না ভেবে থাকেন, তা হলে ভাবুন!

আর ভাবনার খোরাক হিসেবে এই বইটি হাতে তুলে নিন। নানা রকম তথ্য উপাত্ত, ঘটনা, যৌক্তিক আলোচনা ও সার্বজনীন ইসলামি দলিল-প্রমাণের আলোকে চুলচেরা বিশ্লেষণ পড়ুন। এরপর নিজেই বুঝতে পারবেন এই বোকাবাক্সটি আসলে কাদেরকে বোকা বানাচ্ছে? শিরোনাম 'টেলিভিশন' শব্দটি উল্লেখ থাকলেও, সকল প্রকার ইলেকট্রনিক স্ক্রিন এই বইটির আলোচনার সাথে প্রাসঙ্গিক; যেমন- মোবাইল, স্মার্টফোন, ল্যাপটপ, ট্যাবলেট, ডেস্কটপ, মনিটর ইত্যাদি।

এই বইটি বর্তমান বিশ্বের প্রখ্যাত আলিম ও দায়ী শাইখ ওয়াহিদ আবদুস সালাম বালি হাফিযাহুল্লাহর একটি লেকচার সিরিজ ও কিছু খুতবার সংকলন। শাইখের বিভিন্ন লেকচার অবলম্বনে রচিত 'টেলিভিশন অ্যান্ড দ্য ইন্টারনেট : দ্য প্রাইম সাসপেক্টস' শীর্ষক ইংরেজি বইটির নির্বাচিত অংশকে এখানে বাংলায় রূপান্তর করা হয়েছে। বাংলা সংস্করণ প্রকাশকালে সংকলকের পক্ষ থেকে বইটির শেষদিকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রাসঙ্গিক সংযোজন যুক্ত করা হয়েছে; যার মধ্যে রয়েছে—বিখ্যাত ওয়েবসাইট islamqa.info হতে কিছু নির্বাচিত ফাতওয়া, বাড়িতে টেলিভিশন রাখার ক্ষতি সম্পর্কে ড. আইশা হামদানের একটি প্রবন্ধ, ড. সুসান আর জনসনের একটি মূল্যবান গবেষণাপত্র ও কিছু নির্বাচিত উক্তি।

আমরা দুআ করি, আল্লাহ তাআলা যেন আমাদের এই প্রচেষ্টাকে কবুল করে নেন।

মুহাম্মাদ ইউসুফ শাহ
১৪৪২ হিজরি

প্রাইম সাসপেক্ট : প্রধান সন্দেহভাজন!

একজন মুসলিম জানে, নিঃসন্দেহে একদিন তাকে আল্লাহর সামনে হিসাবের জন্য দাঁড়াতে হবে। সেদিন আমরা যা কিছু দেখেছি, শুনেছি সব কিছুর ব্যাপারে প্রশ্ন করা হবে। আল্লাহ বলেন,

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

‘যে বিষয়ে তোমার কোনো জ্ঞান নেই, তার পেছনে পোড়ো না। নিশ্চয়ই কান, চক্ষু ও অন্তঃকরণ এদের প্রত্যেকটিই জিজ্ঞাসিত হবে।’[১]

‘প্রাইম সাসপেক্ট’ বা প্রধান সন্দেহভাজন বলে আমরা সেই ফিতনার কথা বোঝাচ্ছি, যা চুপিসারে প্রায় সকল মুসলিমের ঘরবাড়ি ও মজলিসে প্রবেশ করেছে। এই সন্দেহভাজন অপরাধীকে কোনো ধনসম্পত্তি চুরির অভিযোগে অভিযুক্ত করা হচ্ছে না; বরং সে মানুষকে তার পরিস্থিতি, সম্মান ও নীতি-নৈতিকতার মূল্যবোধ ভুলিয়ে দেওয়ার অভিযোগে অভিযুক্ত।

এই প্রধান সন্দেহভাজন আর কেউ নয়, তার নাম টেলিভিশন! তথা সকল প্রকার ইলেকট্রনিক স্ক্রিন! তার বিরুদ্ধে ১৯টি অপরাধের অভিযোগ আছে। এগুলোর যেকোনো একটিই সমাজের উল্লেখযোগ্য অংশকে দূষিত করার জন্য যথেষ্ট :

১. সে তরুণদের সহিংসতা শেখাচ্ছে।

২. ছেলেমেয়েদের অনৈতিক আচার-আচরণ পরিচর্যা করছে।

৩. ছিঁচকে চুরি থেকে শুরু করে ছিনতাই, ডাকাতির প্রশিক্ষণ প্রদান করছে।

৪. নারীদেরকে উৎসাহিত করছে স্বামীদের অবাধ্যতা ও বিদ্রোহ করতে। ফলশ্রুতিতে পারিবারিক কলহ ও বিচ্ছেদের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

৫. মিথ্যা, প্রতারণা, দুর্নীতি, পাপাচারে উৎসাহ দিচ্ছে।

[১] সূরা বানী ইসরাঈল, ১৭ : ৩৬।

৬. ইসলামি মূল্যবোধ প্রত্যাখ্যান করছে ও সেগুলোকে পশ্চাদপদ, প্রতিক্রিয়াশীল বলা হচ্ছে।
৭. শিক্ষার্থীদের মূল্যবান সময়ের অপচয় হচ্ছে ও পড়ালেখায় ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে।
৮. স্বাস্থ্যগত ক্ষতি; যেমন-চোখ জ্বালাপোড়া, পিঠ ব্যথা, মাথাব্যথা ইত্যাদি বৃদ্ধি পাচ্ছে।
৯. তিনভাবে জাতীয় অর্থনীতির ক্ষতিসাধন করছে।[২]
১০. শিশুদের তাওহীদের আকীদা ধ্বংস করছে।
১১. পুরুষদের নিজের পরিবারের প্রতি বেগায়রত (রক্ষণাত্মক ঈর্ষাবোধ বা আত্মমর্যাদাহীন) করে দিচ্ছে।
১২. মুসলিমদের আল-ওয়ালা ওয়াল-বারা'র (মিত্রতা ও বৈরিতা আকীদা দুর্বল করছে।
১৩. তথাকথিত ধর্মীয় চলচ্চিত্রের নামে ইসলামি ইতিহাসের বিকৃতি সাধন করছে।
১৪. সন্তানের দেখভালে অবহেলা করা, কারণ পিতা-মাতা তাদের পছন্দনীয় অনুষ্ঠান দেখতে খুবই ব্যস্ত।
১৫. তুচ্ছকাজে সম্পদের অপচয় হচ্ছে।
১৬. ধূমপান, মদপানে উৎসাহিত করছে।
১৭. জাতীয়তাবাদের মতো নানা ভ্রান্ত মতবাদের দিকে আহ্বান করছে ও মুসলিম ঐক্যে ফাটল ধরানোর প্রচেষ্টা চলছে।
১৮. ইবাদাত-মূলক কাজে ঢিলেমি, আলসেমি সৃষ্টি করছে।
১৯. ভাষাগত বিকৃতি ও কথ্য ভাষার ব্যবহার বৃদ্ধি পাচ্ছে।

একবার ভাবুন, টেলিভিশন যদি একটি 'বোকাবাক্স' না হয়ে কোনো ব্যক্তি হতো, এসব অভিযোগের পর কি আপনি তাকে সযত্নে বাড়ির ড্রইং রুমে বা বেডরুমে বসিয়ে রাখতেন? হায়! এখন তো এই পর্দা আর ঘরের কোনায় বসে নেই, বরং সবার হাতের মুঠোয় পৌঁছে গেছে!

'যদি বাড়ি ফিরে দেখেন, কোনো অচেনা আগুন্তক আপনার ছেলেমেয়েদেরকে মারামারি শেখাচ্ছে, কিংবা হরেক রকমের পণ্য সামগ্রীবিক্রির চেষ্টা করছে, তাহলে কাল বিলম্ব না করে লোকটিকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দিবেন। কিন্তু আপনি সেই একই মানুষ, যিনি বাড়ি ফিরে দেখতে পান টিভি চালু আছে, কিন্তু এটা নিয়ে দ্বিতীয়বার ভাবার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন না।'[৩]

[২] এ সম্পর্কে আলোচনা সামনে আসছে।
[৩] Jerome Singer, মনোবিজ্ঞানী।

আমাদের জীবনে মিডিয়ার প্রভাব

‘মিডিয়া এই গ্রহের সবচেয়ে শক্তিশালী বস্তু। তারা একজন নির্দোষ মানুষকে অপরাধী হিসেবে দেখাতে পারে, আবার একজন অপরাধীকে নির্দোষ বানাতে পারে, এটাই তাদের শক্তি। কারণ, তারা মানুষের মন ও মগজ নিয়ন্ত্রণ করে।’

- মালিক শাহবাজ ﷺ (ম্যালকম এক্স)।

মিডিয়া কীভাবে মানুষের মনোজগৎ নিয়ন্ত্রণ করে?[৪]

প্রথমত, সাংস্কৃতিক নিয়ন্ত্রণ

বৈশ্বিক মিডিয়া কোম্পানিগুলো যতই নিরপেক্ষতার দাবি করুক না কেন, তারা মূলত বিভিন্ন শক্তিশালী দেশের প্রচলিত মূল্যবোধ এবং ঐতিহ্যের ধারক-বাহক ও প্রচারক। মিডিয়াগুলো মূলত ঐসকল শক্তিশালী দেশের যোগাযোগ মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। এভাবে শক্তিশালী দেশগুলো দুর্বল দেশকে নিয়ন্ত্রণ করে। হারবার্ট শিলার (Herbert Schiller) এর ভাষায়, শক্তিশালী আমেরিকান মিডিয়া সারা বিশ্বে ‘ওয়ার্ল্ড ট্রেড সিস্টেম এর যুতসই মাধ্যম’ হিসেবে কাজ করছে।[৫]

শিলার মনে করেন, আমেরিকার মিডিয়া ইন্ডাস্ট্রিগুলো খুব ঘনিষ্ঠভাবে আমেরিকান শিল্প ও সামরিক স্বার্থের প্রতি অনুগত। প্রথম আরব-উপসাগরীয় যুদ্ধ চলাকালে, আরেকটি নতুন একচেটিয়া মিডিয়া সাম্রাজ্যের আবির্ভাব ঘটল। বিভিন্ন মিডিয়াতে যেভাবে ‘অপারেশন ডেজার্ট স্টর্ম’ এর সংবাদ পরিবেশিত হচ্ছিল, তাতে এটা

[৪] আল-ই’লাম আল-আলামি : মুওয়াস্যাসাতুহ, তরিকাতু আমালিহ ওয়া কাদায়াহ, ড. ফারিস আশতি, দার আমওয়াজ পাবলিশিং এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন, বৈরুত, ১৯৯৬।

[৫] শিলার, ম্যাস কমিউনিকেশন এন্ড আমেরিকান এম্পায়ার, পৃ.৮০; হারবার্ট আরভিং শিলার (১৯১৯ –২০০০); আমেরিকান মিডিয়া সমালোচক, সমাজবিজ্ঞানী, লেখক ও পণ্ডিত।

স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছিল যে, একচ্ছত্র প্রভাবে তাদের ধারেকাছে কেউ ছিল না। উদাহরণস্বরূপ, সিএনএন ছিল তখনকার একমাত্র গ্লোবাল স্যাটেলাইট সংবাদ প্রচারকারী চ্যানেল। শিলারের মতে, তারা পেন্টাগন ও হোয়াইট হাউজের সোর্সের ওপর পুরোপুরি নির্ভর করত। ফলে, যদি কেউ কেবলমাত্র একটি আমেরিকান সংবাদ মাধ্যমের ওপর নির্ভর করে উপসাগরীয় এলাকার ঘটনা প্রবাহ বোঝার চেষ্টা করত, তবে নিশ্চিতভাবেই একপাক্ষিক মতামতের শিকার হতো।

শিলার আরও বলেছেন, আমেরিকান স্যাটেলাইট প্রোগ্রামগুলো দুর্বল ও উন্নয়নশীল দেশের রাজনৈতিক স্বার্থের বিরুদ্ধে কাজ করে এবং তাদের ওপর আমেরিকান কালচার চাপিয়ে দেয়। অথচ উন্নয়নের বাস্তবতা বিচার করলে দেখা যায়, সেসব দেশে পুঁজিবাদী মূল্যবোধ মানানসই নয়। 'ম্যাস কমিউনিকেশন এন্ড আমেরিকান এম্পায়ার' বইতে শিলার বলেছেন, 'প্রত্যেকটি নতুন ইলেকট্রনিক প্রযুক্তি আমেরিকান সাম্রাজ্যের বিস্তারে কাজ করছে। এক্ষেত্রে (আমেরিকান) অর্থনীতির ওপর মিলিটারি প্রভাবকে পৃথক করতে না পারলে, এটি আরও বিস্তৃত ও কর্তৃত্ববাদী হবে।'[৬]

শিলারের 'আদি সংস্কৃতির প্রত্যাবর্তন'-এর ধারণাকে জেরেমি টুনস্টুল (Jeremy Tunstall) 'অবাস্তব' বলে সমালোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন, সম্ভবত পশ্চিমা মিডিয়াগুলো উন্নয়নশীল দেশের বিদ্যমান স্থিতিশীল অবস্থা বা 'স্ট্যাটাস-কো' পরিবর্তনের বদলে সংরক্ষণ করতে চায়, কেননা তুলনামূলকভাবে সমাজের যেসব শ্রেণি অর্থনৈতিকভাবে স্বস্তিকর অবস্থায় আছে তারাই তাদের প্রোগ্রামের দর্শক। টুনস্টুলের মতে, আমেরিকান ও ব্রিটিশ মিডিয়াগুলো সাম্রাজ্যবাদী এজেন্ডার সাথে যুক্ত। বহির্বিশ্বে আমেরিকার অর্থনৈতিক শক্তির উত্থানের বহু আগে থেকেই ব্রিটিশরা দেশে দেশে মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানির 'উন্নয়ন' রপ্তানি করে আসছে। এজন্যেই টুনস্টুল মনে করেন, বিশ্বব্যাপী নানা রকম মন্দের বিস্তারের জন্য শিলার টেলিভিশনকে দায়ী করেছেন।[৭]

ডালাস স্মিথ (Dallas Smythe) একজন পুঁজিবাদ-বিরোধী। তিনি মনে করেন, আজকের মিডিয়া পুঁজিবাদের ঐক্যবদ্ধ ও নিয়মতান্ত্রিক প্রচেষ্টার একটি আবিষ্কার। এর লক্ষ্য, নানারকম সার্ভিস ও ভোগ্যপণ্যের ব্যাপক বাজারজাত করা। তবে মিডিয়া যেভাবে সম্ভাব্য ভোক্তার কাছে পৌঁছে যায় এবং গ্রাহকের সাথে পুঁজিপতিদের সম্পর্ক জুড়ে রাখে, সেটি স্মিথ বেশ পছন্দ করেছেন। স্মিথ মনে করেন, বিভিন্ন মাল্টিন্যাশনাল কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠার পেছনে মিডিয়ার ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সূক্ষ্মভাবে দেখলে

[৬] শিলার, ম্যাস কমিউনিকেশন এন্ড আমেরিকান এম্পায়ার, পৃ.৩০।

[৭] জেরেমি টুনস্টুল, দ্য মিডিয়া আর আমেরিকান (নিউ ইয়র্ক: কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৯৬, পৃ.৬৩)।

বোঝা যায়, মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিগুলো মূলত অতীত সাম্রাজ্যবাদী শক্তির নতুন ভার্সন। অতীতের মতো বর্তমানেও তারা উন্নয়নশীল দেশগুলোর ওপর আধিপত্য বিস্তার করেছে, এই নতুন আধিপত্যের নাম 'সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদ'। তিনি চিহ্নিত করেছেন, পূর্ববর্তী সাম্রাজ্যগুলোর তুলনায় আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ খুবই অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী, কেননা এর শক্তি ও প্রভাবের ভিত্তি যতটা না রাজনৈতিক ও সামরিক, তারচেয়ে বেশি প্রতিষ্ঠিত সাংস্কৃতিক নিয়ন্ত্রণের ওপর।[৮]

পশ্চিমা মিডিয়ার মাধ্যমে কীভাবে সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদের বিস্তার ঘটে, বুঝতে হলে নিচের কারণগুলো দেখুন :

১। অবাধ তথ্য প্রবাহ[৯]

উন্নত দেশ ও উন্নয়নশীল দেশের বৈশ্বিক মিডিয়া কোম্পানিগুলোর মধ্যে ভারসাম্য নেই। ফলে, একটি দেশের ভৌগলিক সীমারেখার ভেতর বড় কোম্পানি থেকে ছোট কোম্পানির দিকে তথ্যের অবাধ প্রবাহ ঘটে এবং আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে উন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশের দিকে তথ্যের বিস্তার ঘটে। অর্থাৎ, উভমুখী অবাধ তথ্যপ্রবাহের বদলে কেবল একমুখী তথ্যপ্রবাহ ঘটে। এটি 'ফ্রি ফ্লো' বা উন্মুক্ত তথ্যপ্রবাহের সুবিধা অর্জনের পথে একটি বাধা। এই ভারসাম্যহীনতার কারণে বড় কোম্পানিগুলো ছোট কোম্পানিগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে কিংবা ধনী দেশগুলো দরিদ্রদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। ম্যাকব্রাইডের একটি রিপোর্ট হতে জানা যায়, উন্মুক্ত তথ্যেপ্রবাহের এই ভারসাম্যহীনতার ব্যাপারে সকলেই একমত, যেমন- লি মনডে ডিপ্লোম্যাটিক, ফিনল্যান্ডের প্রেসিডেন্ট, টুয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরি ফান্ড টাস্কফোর্স, রয়টার্সের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, বিভিন্ন মিডিয়া বিশেষজ্ঞ ও জোট নিরপেক্ষ দেশসমূহের তথ্যমন্ত্রীদের কাছ থেকে অনুরূপ প্রমাণ পাওয়া যায়।

২। ইংরেজি ভাষার ব্যবহার

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অফিসিয়াল (সরকারি) ভাষা ছিল ইংরেজি।

ব্রিটিশরা কয়েক শতাব্দী ধরে সারাবিশ্বে রাজত্ব করেছে। বর্তমান 'সুপারপাওয়ার' আমেরিকার অফিশিয়াল ভাষাও ইংরেজি। সর্বত্র ব্যাপক ইংরেজি ব্যবহারের কারণে দৈনন্দিন কথ্য ভাষাতেও নানা ইংরেজি শব্দ ঢুকে পড়েছে। হার্বার্ট শিলার তার 'ম্যাস কমিউনিকেশন' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকাতে এ বিষয়টি চিহ্নিত করেছেন। শুধুমাত্র উন্নয়নশীল দেশ নয়; বরং ইউরোপেও ইংরেজি ভাষা দ্রুত বিস্তৃত হচ্ছে। তিনি বেশ কিছু চমকপ্রদ তথ্য-উপাত্ত উল্লেখ করেছেন,

[৮] ডালাস স্মিথ, এজেন্ডা সেটিং : দ্য রোল অফ ম্যাস মিডিয়া ইন ডিফাইনিং ডেভেলপমেন্ট, জার্নাল অফ দ্য সেন্টার ফর এডভান্সড টিভি স্টাডিজ ৩, নং ২,১৯৭৫, পৃ ৩৬।

[৯] শিলার, ম্যাস কমিউনিকেশন এন্ড আমেরিকান এম্পায়ার, পৃ ৩৬।

- ১৯৭৫ হতে ১৯৮৫ সালের মধ্যে ১০ বছরের ব্যবধানে ইংরেজি ভাষায় লিখিত প্রবন্ধের সংখ্যা ৫২% থেকে ৬৫%-তে উন্নীত হয়েছে, ওদিকে ফ্রেঞ্চ ও জার্মান ভাষায় লিখিত প্রবন্ধের সংখ্যা ১৩% থেকে নেমে ৭% এ এসেছে।
- ১৯৭৫ থেকে ১৯৮১ সালের মধ্যে, মাত্র ছয় বছরের ব্যবধানে ১২৩টি দেশের মোট পরিসংখ্যান অনুসারে ইংরেজি ভাষায় লিখিত বিজ্ঞান সাময়িকীর সংখ্যা ৭৫% থেকে ৯২% উন্নীত হয়েছে।
- ১৯৮৯ সালে ফ্রান্সের পাস্তর ইনস্টিটিউট হতে তিনটি সাময়িকী প্রকাশিত হয়। তারা সিদ্ধান্ত নেয়, এখন থেকে ফরাসি ভাষায় বদলে ইংরেজিতেই প্রকাশ করবে।

বিশ্বব্যাপী ইংরেজি ভাষার এই বিস্তারের ফলে ১৯৯০ সালের মধ্যেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রযুক্তি খাতে তাদের সাবেক প্রতিদ্বন্দ্বী জাপানকে পেছনে ফেলেছে ও বিশ্বের শতকরা ৭০ ভাগ তথ্য উৎপাদনের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে।

ওপরন্তু, ইংরেজি ভাষার দ্রুত বিস্তার ও ক্রমবর্ধমান ব্যবহারের ফলে সর্বাধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তি ও সামাজিক উন্নয়নের সাথে 'আপডেটেড' থাকার জন্য ইংরেজি জানা আজকাল পূর্বশর্ত হয়ে গেছে। এসব সুবিধার ফলে আমেরিকান ও ব্রিটিশ মিডিয়ার বার্তা সহজেই সারাবিশ্বে ছড়িয়ে যাচ্ছে এবং সাথে তাদের সংস্কৃতিও সারা বিশ্বের মানুষের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে।

৩। ব্যাপকভাবে বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান তৈরি

চলচ্চিত্র নির্মাণের হার এত তীব্রভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, যেন মনে হয় দুনিয়ার প্রতিটি ঘরে এগুলো পৌঁছে গেছে। উদাহরণস্বরূপ, ১৯৯২ সালের পরিসংখ্যান অনুসারে, জার্মানির লোকেরাও শতকরা ৭৫ ভাগ আমেরিকান ফিল্ম[১০] দেখে। 'উন্নত বিশ্বেই' যদি একচ্ছত্র আধিপত্যের এমন চিত্র হয়, তবে মিশর বা ভারতের মতো দেশগুলোর পরিস্থিতি কেমন হতে পারে?

দ্বিতীয়ত, অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ

এই নিয়ন্ত্রণের নেপথ্যে আছে দুইটি বিষয় : প্রথমত, কনজ্যুমারকে (ভোক্তা) এমনভাবে প্রস্তুত করতে হবে যেন ভোক্তা বা সেবাগ্রহীতাদের সংখ্যাবৃদ্ধির মাধ্যমে পুঁজিবাদীদের প্রয়োজন পূরণ হয় এবং দ্বিতীয়ত, পুঁজিবাদী সিস্টেমের মূল্য বৃদ্ধি করা।

[১০] শিলার, ম্যাস কমিউনিকেশন এন্ড আমেরিকান এম্পায়ার, পৃ.৩১।

উদাহরণস্বরূপ, বিশ্ব মিডিয়া কোম্পানিগুলো মূলত একপ্রকার আন্তর্জাতিক কোম্পানি, যাদের প্রাথমিক লক্ষ্য নিজেদের পণ্য বিক্রির বাজার বৃদ্ধি করা, এরপর ভোক্তাকে ক্রমান্বয়ে তাদের ওপর বেশি থেকে বেশি নির্ভরশীল করে ফেলা। এটা কেবলমাত্র তখনই সম্ভব, যখন কোনো পণ্য ক্রয়ের পথে বিদ্যমান মানসিক বাধাগুলোকে সরিয়ে ফেলা যাবে এবং নির্দিষ্ট ধরনের ভোক্তাকে টার্গেট করা হবে।

তৃতীয়ত, বৈশ্বিক মিডিয়া কার্যক্রমের একচোখা নীতি

'যদি বেখেয়ালিভাবে খবরের কাগজ পড়েন, তাহলে মাযলুমের প্রতি ঘৃণা তৈরি হবে আর যালিমকে ভালোবাসতে শুরু করবেন!'

- মালিক শাহবাজ ﵀ (ম্যালকম এক্স)

ক) মিডিয়াতে প্রচারিত তথ্য নিয়ন্ত্রণের নীতি

মিডিয়া কোম্পানিগুলো এমনভাবে বিভিন্ন প্রকারের সংবাদ, অনুষ্ঠান ও বিজ্ঞাপন তৈরি করে, যাতে তাদের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের চাহিদা ও স্বার্থ উদ্ধার হয়। জেনে অবাক হবেন, মাত্র পাঁচটি এজেন্সির মাধ্যমে সারা বিশ্বের সংবাদ নিয়ন্ত্রণ করা হয়; এর মধ্যে চারটি বর্তমানে চালু আছে : (১) এপি বা এসোসিয়েটেড প্রেস, (২) ইউনাইটেড প্রেস; এই দুটি আমেরিকান এজেন্সি (৩) ব্রিটিশদের রয়টার্স এবং (৪) ফরাসিদের এফপি বা ফ্রান্স প্রেস। এসব সংবাদমাধ্যমকে যেসব মিডিয়া কোম্পানি ভিডিও ফুটেজ প্রদান করে, সেগুলো হলো- আমেরিকান সিএনএন, এসিবি, সিবিএস, এনবিসি; ব্রিটিশদের স্কাইনিউজ ও ফরাসি টিএফআই। যতক্ষণ

পর্যন্ত এসব এজেন্সির মাধ্যমে কোনো খবর 'ফিল্টার' করা না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত জনগণের সামনে একটি সিঙ্গেল নিউজ আইটেমও প্রকাশিত হয় না। বলাই বাহুল্য, এসব এজেন্সি সংবাদ 'সম্পাদনার' পূর্ণ স্বাধীনতা রাখে এবং দর্শকদের সামনে সেগুলো নিজেদের ইচ্ছামতো পরিবেশন করে।

আওয়াতিফ আবদুর রহমান উল্লেখ করেছেন, অধিকাংশ আরব সংবাদপত্রের ৫০% খবর আসে ঐসব পশ্চিমা নিউজ এজেন্সি হতে, ২২% আসে আরব নিউজ এজেন্সি হতে আর ২৬% খবরের উৎস অনির্দিষ্ট। এসব অনির্দিষ্ট উৎসের অধিকাংশই বিভিন্ন পশ্চিমা সংবাদপত্র ও রেডিও স্টেশনের ওপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ, বিদেশি খবরের মোট ৭৬% আসে পশ্চিমা কোম্পানি থেকে।[১১]

তিনি আরও উল্লেখ করেছেন, আরববিশ্বে চার প্রকার মিডিয়া নির্ভরশীলতা আছে—

- পশ্চিমা প্রযুক্তির ওপর নির্ভরশীলতা,
- বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর ওপর সামাজিক-সাংস্কৃতিক নির্ভরশীলতা,
- পশ্চিমা নিউজ এজেন্সির ওপর মিডিয়ার নির্ভরশীলতা এবং
- পশ্চিমা মিডিয়া প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর একাডেমিক (শিক্ষাগত) নির্ভরশীলতা।[১২]

মুহাম্মাদ সিম্মাক প্রায় একই মত প্রকাশ করেছেন। পশ্চিমা মিডিয়ার ওপর আরব মিডিয়ার নির্ভরশীলতার পক্ষে তিনি চারটি ফিল্ড উল্লেখ করেছেন। সেগুলো হলো- একাডেমিক (শিক্ষাগত), প্রযুক্তিগত, বাণিজ্যিক ও সংবাদ সংক্রান্ত। উদাহরণ যুক্ত করা

আরেকটি পরনির্ভরশীলতার স্থান হলো, বিভিন্ন প্রোগ্রাম ও চলচ্চিত্র নির্মাণ। মূলত ত্রিশটি কোম্পানির মাধ্যমে এগুলো নিয়ন্ত্রিত হয় যার অধিকাংশই আমেরিকান, বছরে এদের সম্মিলিত রাজস্বের পরিমাণ ১৩৫ বিলিয়ন ডলারের বেশি। সাধারণত অনুষ্ঠান উৎপাদন ও বণ্টনের ক্ষেত্রে আমেরিকান কোম্পানিগুলো বিশ্বব্যাপী একচেটিয়া ব্যবসা করে।

সিবিএস, আরসিএ এবং এনবিসির বার্ষিক প্রতিবেদন অনুযায়ী শিলার উল্লেখ করেছেন, ষাটের দশক থেকে বিশ্বব্যাপী ১০০টিরও বেশি দেশে উক্ত কোম্পানিগুলো বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান তৈরির বাজার সয়লাব করে রেখেছে। জনৈক মার্কিন নিয়োগকর্তার একটি প্রবন্ধ অনুসারে শিলার আরও বলেছেন, যেভাবে আমেরিকান

[১১] আওয়াতিফ আব্দুর রাহমান, দিরাসাত ফি আস-সাহাফা আল-আরাবিইয়া, দার আল-ফারাবি, বৈরুত, ১৯৮৯, পৃ.৩৭।

[১২] আওয়াতিফ আব্দুর রাহমান, দিরাসাত ফি আস-সাহাফা আল-আরাবিইয়া, দার আল-ফারাবি, বৈরুত, ১৯৮৯, পৃ.৩৭ এবং ক্বাদায়া আত-তাবা'ইয়্যা আল-ই'লামিইয়্যা ওয়া আস-সাক্বাফিইয়া ফি আল-আলাম আস-সালিছ, আলাম আল-মা'রিফা, ইস্যু ৭৮, জানুয়ারি ১৯৮৪, পৃ. ৬১-৯৬।

টিভি প্রোগ্রামগুলো বিশ্বব্যাপী টিভি প্রোগ্রামকে নষ্ট করছে, সেভাবে গত ৪০ বছর ধরে হলিউডের মাধ্যমে চলচ্চিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রও নষ্ট হচ্ছে।

১৯৭৮ সালে সুসান আল-কালিনি উল্লেখ করেছেন, ৯১টি উন্নয়নশীল দেশ ৩০% থেকে ৭৫% পর্যন্ত অনুষ্ঠান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমদানি করে।

ওপরন্তু, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান ও ইউরোপ একচেটিয়াভাবে যোগাযোগ ও ইলেক্ট্রনিক নেটওয়ার্ক নিয়ন্ত্রণ করে। আবদুশ শাফি ঈসা বলেছেন, এই ফিল্ডে আমেরিকান শেয়ারের পরিমাণ ১১৭ মিলিয়ন ডলার, জাপানিজ শেয়ারের পরিমাণ ১২১ মিলিয়ন ডলার এবং ইউরোপিয়ান শেয়ারের পরিমাণ ২৩০ মিলিয়ন ডলার, আর বাদবাকি বিশ্বের সম্মিলিত শেয়ারের পরিমাণ ৩৫০ মিলিয়ন ডলার।[১৩]

ইন্টারনেটে ৫০ হাজারের বেশি বিভিন্ন রকমের ওয়েবসাইট আছে, যাদেরকে বিভিন্ন বড় বড় কোম্পানি তথ্যব্যাংক প্রদান করে, এরা নিজেরাই বিভিন্ন অনুষ্ঠান তৈরির সক্ষমতা রাখে।

খ) ব্রেইনওয়াশিং বা মগজধোলাই

'দ্য মাইন্ড ম্যানেজারস' বইতে শিলার মগজ ধোলাইয়ের পাঁচটি 'মিথ' উল্লেখ করেছেন—[১৪]

১. ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ (আত্মকেন্দ্রিকতা) ও ব্যক্তি স্বাধীনতা
২. নিরপেক্ষতা
৩. অপরিবর্তনশীল মানব প্রকৃতি
৪. সামাজিক সংঘাতের অনুপস্থিতি
৫. মাল্টিমিডিয়া

মিডিয়াতে প্রচারিত অনুষ্ঠানগুলোর অন্তর্নিহিত ম্যাসেজের ভিত্তিতে বলা যায়, মিডিয়া কোম্পানিগুলো নিজেদের মতাদর্শের ছাঁচে গড়ে নেওয়ার জন্য মানুষকে কয়েকভাবে প্রভাবিত করে :

ক) ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের ওপর গুরুত্বারোপ করার মাধ্যমে বিদ্যমান সমাজ কাঠামোর সমালোচনা করে ও তদানুসারে কাজ করে। এই লক্ষ্যে সামাজিক সংঘাতহীনতা বা অপরিবর্তনশীল মানব প্রকৃতির ওপর জোরারোপ করে।

খ) অর্থ খরচ করতে মানুষকে উৎসাহিত করা; একে উন্নতির লক্ষণ দাবি করা হয় এবং বলা হয়—ভালোবাসা, সুখ বন্ধুত্ব- এগুলো কেবলমাত্র অর্থ খরচের

[১৩] ড. মুহাম্মাদ আবদুশ শাফি' ঈসা, আল-ফিকর আল-ইসত্রাতিজি আল-আরাবি, ইস্যু ৪৩, নভেম্বর ১৯৯৩, পৃ.৮৬।

[১৪] শিলার, ওয়ার্ল্ড অফ নলেজ সিরিজ, ইস্যু ১০৬, অক্টো. ১৯৮৬, পৃ.১৩-৩০।

মাধ্যমেই অর্জন করা সম্ভব। উদাহরণ যুক্ত করা

গ) বৈচিত্র ও পরিবর্তনের দিকে ইঙ্গিত করা; উদাহরণস্বরূপ, ফিলো সি ওয়াশবার্ন (Philo C. Washburn) বিভিন্ন চ্যানেলে প্রচারিত সংবাদের ওপর একটি তুলনামূলক স্টাডি (২২ নভেম্বর, ১৯৯২) করেন। এসব চ্যানেলের মধ্যে ছিল তিনটি প্রাইভেট চ্যানেল : এপি, সিএনএন, সিবিবি; একটি পাবলিক চ্যানেল : এনপিপি; একটি রাষ্ট্রীয় চ্যানেল : ভয়েস অব আমেরিকা এবং একটি নন-আমেরিকান চ্যানেল : বিবিসি।

এই স্টাডি হতে জানা যায়—সিএনএন ও সিবিএস-এ প্রচারিত সংবাদের মধ্যে সাদৃশ্য আছে।

এপি প্রচারিত প্রেসিডেন্সিয়াল নির্বাচনের খবরে কিছু ভিন্নতা দেখা যায়। তবে, জাতীয় সংবাদের ক্ষেত্রে এই তিন চ্যানেলে তেমন কোনো ভিন্নতা দেখা যায়নি। আর 'ভয়েস অব আমেরিকা' ও বিবিসি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বেশি গুরুত্ব আরোপ করে।[১৫] আর তিনটি চ্যানেলের প্রতিটিই নিউজ কাভারেজে কিছু তথ্য বিকৃত করেছে।[১৬]

ঘ) কোনো আসন্ন শত্রুর ব্যাপারে সচেতনতা বৃদ্ধি করা, যেমন কমিউনিজম (সমাজতন্ত্র) বা ইসলাম অথবা অন্য যেকোনো শক্তি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে তারা নাৎসিদের শত্রু গণ্য করত, বিশ্বযুদ্ধের পর সমাজতন্ত্রকে শত্রু নির্ধারিত করল, আর বর্তমানে ইসলামকে টার্গেট করেছে।

১৯৯২ সালে Le Monde Diplomatique নামক মাসিক পত্রিকায় 'মিডিয়ার প্রভাব, সাংস্কৃতিক অপব্যাখা ও বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে মানবাত্মার ক্ষতিসাধন' সংক্রান্ত বিষয়ে দুটি বুকলেট প্রকাশ করে। এগুলোর শিরোনাম হলো, The Media, Lies, Democracy (মিডিয়া, গণতন্ত্র ও মিথ্যাচার) এবং, Man's Struggle Against the Scientific Danger (বৈজ্ঞানিক বিপত্তির বিরুদ্ধে মানুষের সংগ্রাম)। এই দুটি বুকলেটে মিডিয়ার বিশ্বায়ন, এডভার্টাইজিং ও সংবাদ বিকৃতির ব্যাপারে আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়া মিডিয়ার সাথে শক্তি, ক্ষমতা ও মিডিয়া নিয়ন্ত্রণের পারস্পরিক সম্পর্কের আলোচনাও রয়েছে।

উক্ত ম্যাগাজিন ১৯৯৫ সালে আরেকটি বুকলেট প্রকাশ করে, যার শিরোনাম 'Communication and Control of Thought' (যোগাযোগ ও চিন্তা নিয়ন্ত্রণ)। এই বুকলেটে দুইজন বিশেষজ্ঞ একটি স্টাডি উপস্থাপন করেছেন যাতে পুরো

[১৫] শিলার, ডেমোক্রেসি এন্ড মিডিয়া ওনারশিপ, পৃ.৫৬৬।

[১৬] ইন মিডিয়া কালচার এন্ড সোসাইটি ভলি.১৭, নং ৪, অক্টো. ১৯৯৫, পৃ.৬৫২।

পৃথিবীকে একটি গ্লোবাল ভিলেজে রুপান্তর করা, গণতন্ত্রের মোকাবিলায় মিডিয়া টেকনোলজির বিপদ ও একক কণ্ঠস্বরের আধিপত্য নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

চতুর্থত, মিডিয়ার ব্যাপক বিস্তার যখন নতুন হুমকি

ড. বাসিউনি ইবরাহীম হামাদা[১৭] ইন্টারনেটের কিছু বিপত্তি তালিকাবদ্ধ করেছেন, যার কিছুটা গ্লোবাল মিডিয়ার ক্ষেত্রেও সাধারণভাবে প্রযোজ্য। এগুলো নিম্নরূপ :

১. তথ্য মোড়লিপনার অবসান :

কোনো সরকার তার জনগণের কাছ থেকে কোনো তথ্য লুকিয়ে রাখতে পারবে না। অন্য কথায়, বিভিন্ন প্রতিদ্বন্দী সোর্স ও বৈরী দেশ ইন্টারনেটের মাধ্যমে তথ্য ফাঁস করতে পারে বিধায় জাতীয় নিরাপত্তা আর আগের মতো সুরক্ষিত নয়। তবে আসল সমস্যা হলো, বিভিন্ন দেশের সরকার ও গোয়েন্দা বাহিনীগুলো আগের মতো তথ্যের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারে না, ফলে জনগণের কাছ থেকে সবকিছু লুকিয়ে রাখাও সম্ভব নয়। উদাহরণস্বরূপ, যদি কোনো উন্নয়নশীল দেশের সরকার জনগণের কাছ থেকে কোনো নির্দিষ্ট ইভেন্ট লুকিয়ে রাখতে চায়, হোক সেটা নিরাপত্তার খাতিরে বা অন্য কোনো কারণে, এখন এটা আর সম্ভব নয়। কোনো-না-কোনো উপায়ে এসব ঘটনার বিস্তারিত খবর জনগণের কাছে পৌঁছে যাবে। সুতরাং, স্বচ্ছতার নীতি অনুসরণ ও সংবাদ প্রচারের ক্ষেত্রে বাস্তবানুগ হওয়া ছাড়া কোনো অপশন নেই।[১৮]

২. রাষ্ট্রীয় ভৌগোলিক আধিপত্যের বিরুদ্ধে ইন্টারনেট একটি হুমকি :

ইন্টারনেটের মাধ্যমে যদি কোনো রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বকে চ্যালেঞ্জ করা হয়, তবে তারা অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক বা সামাজিক আচরণ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে এর মোকাবিলা করতে প্রায় পুরোপুরি অসহায়। কেননা একজন ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর কোনো ভৌগলিক সীমাবদ্ধতা নেই এবং অদ্যবধি আন্তর্জাতিক আইন কানুনের মাধ্যমে এটি মীমাংসার কোনো উপায় নেই।

৩. সাংস্কৃতিক পরিচয়ের প্রতি ইন্টারনেট হুমকি :

ইন্টারনেটের বিস্তারের কারণে নিজস্ব সাংস্কৃতিক পরিচিতি ধরে রাখা একটি দুঃসাধ্য কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। একজন ইন্টারনেট ব্যবহারকারী পৃথিবীর যেকোনো প্রান্তের যেকোনো কালচারের আরেকজন মানুষের সাথে যোগাযোগ ও বন্ধুত্ব করতে পারেন, ইন্টারনেটের মাধ্যমে সময় ও স্থানের প্রচলিত ধারণা বদলে গেছে। বিষয়টা ভাবতে বেশ ভালোই লাগে, কিন্তু এর লুকানো বিপদগুলো ধীরে ধীরে আমাদের

[১৭] ইতিজাহাত আলামিইয়্যা হাদীসা ফি বুহুস আল-ই'লাম ওয়া টেকনোলজিইয়াত আল-ইত্তিসাল, কিতাব আল-বায়ান, আল বায়ান পাবলিশার্স, দুবাই,২০০৩।

[১৮] ইলমু আদ-দীন, পৃ.১১৩, ১৯৯৬।

দিকে এগিয়ে আসছে।

ইন্টারনেটের দুনিয়াকে যতটা বহুত্ববাদী মনে করা হয় আসলে তেমন নয়। কালচার ও ভাষার যতটা বৈচিত্র থাকার কথা ছিল, তেমনটা নেই; বরং একটি একক কালচারের উদ্ভব ঘটছে। উদাহস্বরূপ, ইন্টারনেটের (প্রধান) ভাষা ইংরেজি আর লাইফস্টাইল আমেরিকান। এখন পর্যন্ত পৃথিবীর অধিকাংশ ভাষা যোগাযোগের এই সর্বাধুনিক মাধ্যমকে আয়ত্ত করতে অপারগ। কিছু পরিসংখ্যান দেয়া যাক; ৬৪% ইন্টারনেট ব্যবহারকারী ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে যোগাযোগ করেন আর বাকি ৩৬% অন্যান্য ভাষা ব্যবহার করেন, (যার মধ্যে ২০.৫% ইউরোপিয়ান ভাষাভাষী আর ১৫.৫% এশিয়ান ভাষাভাষী) অর্থাৎ ইন্টারনেটের সকল ভাষার ৬৫% ইংরেজি, যা ক্রমবর্ধমান।[১৯] ভুলে গেলে চলবে না, ভাষা শুধুমাত্র যোগাযোগের মাধ্যম নয় বরং একটি কালচার, সভ্যতা ও লাইফস্টাইলের ধারক-বাহক।

অন্যান্য প্রথাগত যোগাযোগ ব্যবস্থা হতে ইন্টারনেট যে কারণে ভিন্ন :

ক) ইন্টারনেটের কার্যক্রম কোনো নির্দিষ্ট স্থায়ী অফিস বা কেন্দ্রীয় অফিসে সীমাবদ্ধ নয়, যেমনটা টিভি বা সংবাদপত্রের ক্ষেত্রে দেখা যায়।

খ) অনলাইনে কোনো কিছু প্রচার করলে সেটা গুটিকয়েক মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। যে কেউ এখানে লেখক, সাংবাদিক বা নিউজ এজেন্সির কাজ করতে পারেন।

গ) ইন্টারনেট একজন ব্যক্তিকে নিজ সংস্কৃতি পালনের পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করে, সে পৃথিবীর যেখানেই থাকুক না কেন। এই অর্থে অনলাইনে স্থানীয় সংস্কৃতি হুমকির সম্মুখীন হয় না।

ঘ) সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, এখানে কাউকে কোনো তথ্য গ্রহণ করতে বাধ্য করা হয় না; বরং একজন ব্যবহারকারী নিজেই নিজের চাহিদা মোতাবেক তথ্য ও ওয়েবসাইট খুঁজে বের করেন। ফলে ব্যক্তি নিজে ইতিবাচক হলে নেতিবাচক প্রভাবের ক্ষতির আশঙ্কা কম থাকে।

ঙ) এখানে কোনো রাষ্ট্রকে দমিয়ে রাখা সহজ নয়। যেমন- কোনো রাষ্ট্র যদি আমেরিকান সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যের ওপর নির্ভরশীল থাকতে চায় কিংবা তাদের বিরুদ্ধে পাল্লা দিতে চায়, তা হলে সহজেই নিজস্ব ওয়েবসাইট প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তা করতে পারবে।

[১৯] গ্লোবাল ইন্টারনেট স্টাটিসটিক্স বাই ল্যাংগুয়েজ।

৪. মুদ্রার সার্বভৌমত্ব :

নিজেদের অর্থনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনা করা একটি রাষ্ট্রের অন্যতম দায়িত্ব। যেহেতু ইলেকট্রনিক মুদ্রার লেনদেন ক্রেডিট কার্ডকে ছাড়িয়ে গেছে, যতই দিন যাচ্ছে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পক্ষে এসব কার্যক্রম মনিটর করা ও বৈধ টেন্ডারের হিসাব রাখা কঠিন হয়ে যাচ্ছে। ইন্টারনেটে অর্থনৈতিক লেনদেন অনেকটাই চুপিসারে সারা হয়। আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, ই-বিজনেসের লেনদেনে কাউকে সরাসরি অন্যের সাক্ষাৎ করতে হয় না, এতে অর্থ জালিয়াতির সুযোগ থাকে।[২০]

৫. ইন্টারনেট একটি রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বকে চ্যালেঞ্জ করতে পারে :

যেকোনো রাষ্ট্রের ভৌগলিক সার্বভৌমত্বের প্রতি ইন্টারনেট একটি বাস্তব চ্যালেঞ্জ। স্যাটেলাইট ট্রান্সমিশনের মাধ্যমে যে তথ্য বিনিময় হচ্ছে তার সবকিছু একটি রাষ্ট্রের পক্ষে মনিটর করা, সেন্সর করা বা চেক করা সম্ভব নয়। তথ্যপ্রবাহে যেকোনো নিয়ন্ত্রণ আরোপ বা বাধাদানের চেষ্টা অনেক খরুচে ব্যাপার।[২১]

৬. ইন্টারনেটে একটি রাষ্ট্রের প্রচলিত ভূমিকা বদলে দিতে পারে :

যোগাযোগব্যবস্থায় প্রযুক্তিগত বিপ্লবের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া হিসেবে একটি রাষ্ট্র তার জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সার্বভৌমত্ব বজায় রাখতে অনেক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়। প্রতিনিয়ত নিজেদের ভূমিকা ও ব্যবস্থাপনার পদ্ধতি পর্যালোচনা করতে হয়। উদাহরণস্বরূপ, ইন্টারনেটের কারণে প্রয়োজনীয় আইন তৈরির ব্যাপারটি আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে, শুধু নিজেদের ব্যবস্থাপনার মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। ইন্টারনেটের বহুবিধ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় রাষ্ট্র তার নাগরিকদের প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা সেবা সরবরাহ করতে ব্যর্থ হচ্ছে।[২২]

---

[২০] ফ্রেজা, ১৯৯৮ এবং এঙ্গেল, পৃ. ২৪৭, ২০০০।

[২১] চ্যাপম্যান, ১৯৯৮,পৃ.৪ এবং এঙ্গেল, পৃ.২৪৭, ২০০০।

[২২] এঙ্গেল, পৃ.২৪৭, ২০০০ এবং লাবার্স, পৃ.২, ২০০০।